ইতিহাসের সরণী বেয়ে

রাজগীরের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পাঁচটি পাহাড়ের সন্নিবেশে রাজহারা পাহাড়। এই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে শ্বেতশুভ্র বৌদ্ধমন্দির 'শান্তিস্তূপ'। বৌদ্ধগয়া আর নালন্দার আকর্ষণও কিছু কম নয়। দেখে এলেন শুক্লা ভট্টাচার্য

শীত প্রায় যাওয়ার মুখে। তবু সামান্য শীতের আমেজ পেয়েই মন হয়ে উঠেছে উড়ু-উড়ু। এদিকে অফিসে কাজের চাপ, ২-৩ দিনের বেশি ছুটি মিলবে না। অথচ মন চাইছে, প্রকৃতির নতুন রূপ দেখতে। এক বন্ধু বলল, 'রাজগীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। অনেক ইতিহাসেরও সাক্ষী রাজগীর এবং নালন্দা।' সঙ্গে সঙ্গে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে রাজগীর, নালন্দা যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলি।

মাত্র একদিনের পরিকল্পনায় আমরা রাজগীর রওনা দিই। তাই ট্রেনের রিজার্ভেশন পেতে ভরসা হল তৎকাল টিকিট। হাওড়া থেকে রাত সাড়ে আটটার দানাপুর এক্সপ্রেসে চড়ে আমরা রাজগীর রওনা দিই। দানাপুর এক্সপ্রেস অবশ্য সরাসরি রাজগীর যায় না। ওই ট্রেনে চড়ে আমরা প্রথমে পৌঁছই বক্তিয়ারপুর। পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই ট্রেনটি বক্তিয়ারপুর স্টেশনে ঢুকে যায়। সেখান থেকে আবার লোকাল ট্রেন ধরে রাজগীর স্টেশন। বক্তিয়ারপুর থেকে গাড়িতেও রাজগীর যাওয়া যায়। তবে সোয়েটার-চাদরে মুড়ি দিয়ে, ট্রেনের জানলার ফাঁক দিয়ে হিমেল হাওয়ার পরশ নিতে-নিতে ভোরের সূর্যোদয়ের দৃশ্য উপভোগ করতেই আমরা বক্তিয়ারপুর-রাজগীর লোকাল ট্রেনে চড়ে বসি। এই ট্রেনে রাজগীর পৌঁছোতে সাধারণত দু'ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু আমরা যেদিন যাই, সেদিন ট্রেনটি এক ঘণ্টা দেরি করে। নালন্দা স্টেশনেই প্রায় ৪০ মিনিট দাঁড়িয়েছিল। ওই সময়ে কিছুটা বিরক্ত লেগেছে ঠিকই, তবে ওই ৪০ মিনিটে বিহারের ছাপোষো মানুষজনের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি অনেকটাই ধরা পড়ল। ওই ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রীই ছিল বিহারের তথাকথিত অশিক্ষিত গ্রাম্য বাসিন্দা। এঁদের কাছে এখনও মাঠে শৌচকর্ম করা, গাছের ডালকে দাঁতন হিসেবে ব্যবহার করা যে নিত্য-নৈমেত্তিক ব্যাপার, তা ট্রেনটি নালন্দা স্টেশনে না দাঁড়ালে বুঝতে পারতাম না। আবার ভোরের হিমেল হাওয়ার মধ্যে ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে উনুন জ্বালিয়ে প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রীর চা বিক্রি করার দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল, যেন আশির দশকের সিনেমা দেখছি।

বিহার সম্পর্কে কিছুটা খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়েই আমরা রাজগীর স্টেশনে নেমেছিলাম। তবে স্টেশনের বাইরে আসতেই মনে হয়, আশির দশকে চলে এসেছি। স্টেশনের বাইরে যেতেই যাত্রী তুলতে ছুটে এল টাঙ্গা চালকেরা। রাজগীর স্টেশনের বাইরে রিকশা, অটো বা ম্যাজিক ভ্যান নয়, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে টাঙ্গা ওরফে ঘোড়ার গাড়ি। আমরা ওই টাঙ্গায় চড়েই হোটেলে যাই। হোটেলে চটপট স্নান খাওয়া সেরে, দু'ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি রাজগীর দর্শনে। এবারেও আমাদের বাহন টাঙা। পড়ন্ত বিকেলের রোদ গায়ে মেখে টাঙ্গার পিছনে বসে পাহাড় ঘেরা, ইতিহাসে মোড়া রাজগীর শহরটি সত্যিই অন্যরকম। মহাভারতের দ্রৌপদীর মনসা মন্দির থেকে শুরু করে জরাসন্ধ আখড়া, মৃগক্ষেত্র, বিম্বিসার জেল ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সংস্কারের অভাবে ব্রহ্মকুণ্ড অতীত-গৌরব হারালেও তার প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ কমেনি। তবে রাজগীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান রাজহারা পাহাড়। ৬৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত পাঁচটি পাহাড়ের সন্নিবেশ হল রাজহারা পাহাড়। এই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে শ্বেতশুভ্র বৌদ্ধমন্দির 'শান্তিস্তূপ'। এখানে পায়ে হেঁটে যাওয়ার রাস্তা থাকলেও পর্যটকেরা সাধারণত রোপওয়ে চড়েই ওঠেন। এখানকার রোপওয়েটি বেশ রোমাঞ্চকর, চারদিক খোলা এবং একটিতে একজনই বসতে পারবেন। রুক্ষ পাহাড়ের ঢাল বরাবর রোপওয়েটি যখন উঠছিল, তখন বুকের ভিতর দুরু-দুরু করবেই। তবে পাহাড়ের কাঠিন্য মনে দৃঢ়তাও আনে। আবার ওই রোপওয়ে করে নামার সময় নীচের সাজানো-গোছানো শহরটিকে দেখে মনে হয় আমরাই 'সৃষ্টিকর্তা'! রাজগীরে বাঁদরের যে অভাব নেই, তা রোপওয়ে দিয়ে ওঠা-নামার সময় বাঁদরের দলবলকে দেখলেই বোঝা যায়। ওই পাহাড়ের ঢালেই বোধহয় ওদের বসতি। ফলে রোপওয়ে করে যাওয়া-আসার সময় যদি কেউ বাঁদরের হামলার মুখে পড়েন, তা হলে সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক হবে না।

একবেলার মধ্যেই আমাদের রাজগীর শহরের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখা হয়ে গিয়েছে। তাই রাতে হোটেলে ফিরেই পরদিন বুদ্ধগয়া আর নালন্দা যাওয়ার ছক করে ফেলি। রাজগীর থেকে বুদ্ধগয়া প্রায় ৩ ঘণ্টার দূরত্ব। নালন্দা যেতেও ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। তাই এই দু'টি জায়গায় যাওয়ার জন্য টাঙ্গার ভরসা না করে আমরা হোটেলের গাড়ি বুক করি। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ গাড়ি ছাড়ে। গাড়িটি যখন বুদ্ধগয়া পৌঁছোয় তখন বেলা ১০টা বেজে গিয়েছে। একপাশে গগনচুম্বী রুক্ষ পাহাড়, আর একপাশে সবুজ প্রান্তর, আর সামনের খোলা আকাশের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত রাস্তার মধ্য দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে কখন তিন ঘণ্টা কেটে গিয়েছে তা বুঝতেই পারিনি। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি যেন তার সমস্ত রূপ এখানেই মেলে ধরেছে। রাজগীর সুন্দর শুনেছিলাম, এতটা সুন্দর তা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। গাড়িটি গয়া শহরে ঢোকার পরই সংবিত ফিরল। তারপর বুদ্ধগয়ায় ঢুকে যেন এক অন্য জগতে প্রবেশ করলাম। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের ধ্যানমগ্ন গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে গেলেই যেন মনে একটা প্রশান্তি নেমে আসে। এ ছাড়া যে বৃক্ষের নীচে বসে বৌদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন সিদ্ধার্থ, সেই বোধিবৃক্ষের মহিমা আজও অম্লান মনে হয়। আজও বোধিবৃক্ষের সামনে সমবেতভাবে প্রার্থনায় শামিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা। সুন্দরভাবে সাজানো, কারুকার্য খচিত মহাবোধি মন্দিরে সুশৃঙ্খল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের আচরণ সত্যিই শেখার মতো। মন্দির চত্বরে একটি বাজারও রয়েছে। সেখানে বুদ্ধদেবের মূর্তি থেকে ঘর সাজানোর জন্য নানা উপকরণ বিক্রি হচ্ছে। তবে অবশ্যই দরাদরি করে কিনতে হবে, না হলে ঠকতে হবে। আমরা টুকিটাকি কয়েকটি জিনিস কিনে ফের গাড়িতে উঠি, রওনা দিই নালন্দার দিকে। ফের ৩ ঘণ্টার পথ পেরিয়ে, রাজগীর শহর ছাড়িয়ে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছোই নালন্দায়। ততক্ষণে পেটের মধ্যে ছুঁচোর কীর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকে একটি ধাবায় প্রথমে পেটপুজো করি। তারপর টিকিট কেটে ঢুকি শতাব্দী প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মূল ফটক পেরিয়ে সামনের দিকে যত এগোই, ততই ধ্বংসপ্রাপ্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত চেহারাটা ফুটে ওঠে। মনে হয়, সুদূর অতীতে চলে এসেছি। বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ সহ দেশ-বিদেশের মানুষেরা যে সমস্ত শ্রেণিকক্ষে বসে ক্লাস করেছেন, সেই সমস্ত শ্রেণিকক্ষ বর্তমানে ছাদহীন ইট ঘেরা কুঠুরিতে পরিণত হলেও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের বৌদ্ধ মন্দিরটিও ভাঙাচোরা সিঁড়িতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজও সেই মন্দিরকে লক্ষ্য করে গাছের নীচে প্রার্থনায় সমবেত হন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা। ৩০ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত সবুজে ঘেরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘুরতে-ঘুরতে দু'ঘণ্টা অনায়াসে কেটে যায়। এতটুকু ক্লান্ত লাগেনি। বরং ইতিহাস প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে চাক্ষুষ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত বোধ হয়। নালন্দা থেকে বেরিয়ে গাড়ি আমাদের নিয়ে যায় পাওয়াপুরি মন্দিরে। রাজগীর শহরের বাইরে এক দিঘির উপর অবস্থিত জৈনদের এই মন্দিরটির সঙ্গে রাজস্থানের জলমহলের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সারাদিন দাপাদাপি করার পর গোধূলির আলোয়, পাখিদের কলকাকলির মাঝে জল দিয়ে ঘেরা এই মন্দিরের চাতালে বসলে মন উদাস হবেই। এই মন্দিরটি দেখেই আমরা রাজগীর দর্শন সম্পূর্ণ করি। এরপর ফেরার পালা। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন ভোরেই বক্তিয়ারপুরের উদ্দেশে রওনা দিই। সেখান থেকে ট্রেন ধরে হাওড়া। হাওড়া থেকে রাজগীর যাওয়ার পথ একটু জটিল বটে, কিন্তু রাজগীরের রুক্ষ প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং শতাব্দী প্রাচীন নালন্দার মতো ঐতিহাসিক স্থান চাক্ষুস করার পর যাতায়াতের সমস্ত কষ্ট যেন কড়ায় গণ্ডায় উসুল হয়ে যায়।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেসে চড়ে সরাসরি রাজগীর যাওয়া যায়। এ ছাড়া দানাপুর এক্সপ্রেস বা বিভূতি এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়ে ৯ ঘণ্টায় পৌঁছোনো যায় বক্তিয়ারপুর। সেখান থেকে লোকাল ট্রেন বা ছোট গাড়িতে দু'ঘণ্টার পথ রাজগীর।

কোথায় থাকবেন

রাজগীর স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে ছোট-বড় বহু হোটেল রয়েছে। বাঙালি হোটেলও রয়েছে। সরাসরি সেখানে গেলেই ঘর ভাড়া পাওয়া যায়।

plan করুন

লোসার উৎসব

অরুণাচলের তাওয়াং জেলা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত নয়। বৌদ্ধদের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধদের বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। তিব্বতি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী লোসার উৎসবের দিনটিকে বছরের প্রথম দিন ধরা হলেও নবম তিব্বতি রাজা এটাকে চাষবাস শুরুর প্রকৃত সময় বলে ঘোষণা করেন। লোসার উৎসব শুরুর কিছুদিন আগে থেকেই লোকজন নিজের ঘর বাড়ি পরিষ্কার করতে শুরু করেন। ঘরের দেওয়ালে সূর্য, চন্দ্র, স্বস্তিকা আঁকেন। আগুন জ্বালানোর জন্য জুনিপার, রডোডেনড্রন, সিডার গাছের ডাল জড়ো করেন। বিশেষ খাবার এবং মদ্য প্রস্তুত হয় ঘরে ঘরে। ভেড়ার মাথা রঙিন মাখন দিয়ে সাজানো, এই উৎসবের একটা রীতি। অরুণাচলের মতো তিব্বত সংলগ্ন ভুটানেও একই রীতিতে লোসার উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব পনেরো দিন ধরে পালিত হলেও প্রথম পাঁচ দিন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিন তিব্বতি 'বিয়ার' চাঙ্কল প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় কিংস লোসার। নাচগান-সহ এই রঙিন উৎসবটি সকলের কাছেই দর্শনীয়। এই বছর লোসার উৎসব ১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি।